সেকেলে মানুষ

• হুমায়ূন কবির

[লেখক আমেরিকা প্রবাসী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চারটি বিষয়ে আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড। অবসরে সাহিত্যচর্চা করেন। তার রোগীদের কাহিনী আর সেই সঙ্গে আমেরিকার জীবনযাত্রার নানা দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন এই সিরিজে]

(পর্ব পাঁচ)

লোকটি শিক্ষক। প্রাক্তন প্রিন্সিপাল। আর্মির এক সময়ের রিজার্ভ অফিসার। এই শহরের অর্ধেক লোক তার ছাত্র। তেপ্পান্ন বছরের দাম্পত্য জীবন। এ রকম দীর্ঘস্থায়ী বিয়ে এ দেশে কমই দেখা যায়। বছর দশেক ধরে আমার কাছে আসছেন। কখনই একা আসতে দেখিনি। সব সময় দুজনে একসঙ্গে। শ্রদ্ধা করার মতো দম্পতি। এসেই ভদ্রলোক একটা ডাইরি খুলে বসবেন। জরুরি সব কথা টুকতে থাকবেন। নিজে কথা বলবেন কদাচিৎ। অসুখের সব বিবরণ স্ত্রীর কাছ থেকেই আসে। আমাদের কাজের কথাবার্তা সব শেষ হলে উঠে দাঁড়াবেন। বের হওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু ভদ্রমহিলা উঠবেন না। ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুরু হবে তখন। ভদ্রলোক উসখুস করতে থাকবেন। মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন, 'চলো না! ডাক্তারের তো আরো রোগী আছে।' তাতে তেমন কাজ হবে না। কথা চলতেই থাকবে।

আমি অভ্যস্ত এই রুটিনে। প্রথমে কুশলাদি দিয়ে শুরু। আমার বাবা-মার প্রসঙ্গ উঠবে। এরপর খানিক বাংলাদেশের ওপর প্রশ্ন। সন্ত্রাস আক্রান্ত বিশ্ব সংবাদ। কোনো কোনো দিন তার লেখক ছেলের কথা। সাম্প্রতিক বইয়ের ওপর কথাবার্তা। এভাবে কথা চলতেই থাকবে। এক সময় ভদ্রলোক এক রকম টেনেই তুলবেন স্ত্রীকে।

আজ এর উপায় ছিল না। হাসপাতালের রাউন্ডে অস্বাভাবিক দেরি হয়ে গেছে। খারাপ একটা কেস নিয়ে আটকে ছিলাম। অফিসে ঘণ্টাখানেক পিছিয়ে আছি। লাঞ্চটাইম শেষ। এখনো খাওয়া হয়নি। কাজেই তাড়াহুড়ো করেই শেষ করছি সব। রুটিন ভিজিট। তেমন কিছু করারও ছিল না। শেষ হতেই আজ আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে দরজা খুলতে গেলাম।

ভদ্রমহিলা আমার তাড়া টের পেয়েছেন। নিজেও উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা শুরু করলেন।

– তোমাকে দেখে খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে আজ। অনেকদিন ভ্যাকেশনে যাওনি বুঝি?

– না না। এই তো কয়েকদিন আগেই ঘুরে এলাম দেশ থেকে।

– ঘুরে তো এসেছ, কিন্তু মনে হচ্ছে না রেস্ট নিয়েছ। তোমাকে একটা কথা বলব?

মনে মনে খানিক বিরক্তই হচ্ছিলাম; কিন্তু কিছু করার নেই। ভদ্রতা বলে কথা!

– অবশ্যই। বলো কী বলবে?

– তুমি সামনের উইকএন্ডে তোমার বউকে নিয়ে মাছ ধরতে যাও।

দক্ষিণাঞ্চলীয় এই এলাকায় শিকার করা আর মাছ ধরা প্রায় সব পুরুষেরই নেশা। হয়তো ভেবেছে আমারও তা-ই। তবে অবাক হলাম। কারণ মহিলারা সাধারণত পুরুষদের এই নেশায় মহা বিরক্ত।

– মাছ ধরতে বউকে নিয়ে যাব কেন?

– কেন যাবে না? দুজন পাশাপাশি বসে থাকবে। প্রকৃতির কাছাকাছি। এর চেয়ে মজার আর কী হতে পারে! আমরা তা-ই করি।

আমি তাকিয়ে থাকলাম সরাসরি। ভদ্রমহিলার মুখে একটা মধুর হাসি।

– আর হ্যাঁ। আরো একটা কথা। সেল ফোনটা ঘরে রেখে যাবে। বউকে নিয়ে যখন বাইরে যাবে সেলফোন সঙ্গে নেবে না। ঠিক আছে?

এবার আমি থমকে গেলাম। চাবুকের মতো এসে লাগল কথা কয়টা। সেলফোন ছাড়া কবে বের হয়েছি মনেই করতে পারলাম না। কী আশ্চর্য! এভাবে চিন্তা করিনি তো কখনো!

বিরক্তি সরে গিয়ে শ্রদ্ধা এসে ভর করল মনে। কথাগুলো আর মুহূর্তটা ধরে রাখতে চাইলাম। ছবি তোলার অনুমতি চাইতেই ভদ্রলোকের হাতটা চেপে ধরে একটা পোজ।

– আমি তৈরি। তুলতে পারো এবার।

– এই ছবি আর কাহিনীটা কিন্তু ফেসবুকে যাবে। অসুবিধা নেই তো?

– যেখানে ইচ্ছা পাঠাও। আমাদের কিচ্ছু আসে যায় না। আমাদের টিভিও নেই, কম্পিউটারও নেই।

– মানে?

– মানে বুঝলে না? আমাদের টিভি-কম্পিউটার ছাড়াই চলে। তাই বাড়িতে ও দুটো যন্ত্র নেই। আমরা হলাম গিয়ে সেকেলে মানুষ।

ওরা চলে যাওয়ার পর এই 'সেকেলে মানুষ'দের নিয়ে চিন্তা শুরু হলো। কিন্তু সেই চিন্তার সময় কি আছে? টুং করে আওয়াজ হতেই আড়চোখে সেলফোনটার দিকে নজর গেল। কয়েকটা টেক্সট মেসেজ জমা হয়ে আছে। আরো একটা এলো এখন। এদিকে ইন্টারকমে এ্যামিলির গলা, 'পরের রোগী পাঠাব? তুমি কিন্তু এখন দুই ঘণ্টা পিছিয়ে আছ।' ■

[আমেরিকার নিয়ম মেনে প্রতিটি রোগী অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর প্রিয়জনের কাছ থেকে ছবি এবং কাহিনী প্রকাশের যথাযথ অনুমতি নেয়া হয়েছে]